জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

কুমিল্লায় মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন: নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদ

মোঃ শাহ আলম*

Abstract

The Nawab Faizunnesa Jame Mosque, built by Nawab Faizunnesa Chaudhurani at Paschim Gao in Laksham Upazila of Cumilla district is one of the best Muslim monuments in Bangladesh which was built during the colonial rule. This mosque is built in a rectangular plan. The archaeological site occupies the features of the mosque with its grooved arch, panel design, pendentive dome construction, open entrances etc. Flower-vine-leaves and geometric designs, stucco and fresco designs have been used as decorations on its walls. There are ten domes on the roof of this mosque. The use of finial with lotus flowers and pitcher (kalas) at the top of the dome and the top of the tower is very attractive to see. This article discusses how this mosque discloses the glory of muslims during the colonial rule with the best examples of Cumilla Muslim art and advanced artistic designs and how the modern world has achived outstanding universal value.

ভূমিকা

কুমিল্লা জেলা প্রাচীনকাল থেকেই খুবই পরিচিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এই স্থানে প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থাপনা, ধর্মীয় মন্দির, গির্জা, মসজিদ প্রভৃতি। প্রাচীনকালে কুমিল্লা অঞ্চলে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের প্রাধান্য থাকায় স্থাপত্যের মধ্যেও এদের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীনকালে তৈরি স্থাপনার মধ্যে রয়েছে মন্দির, বিহার ও উপাসানালয়, মঠ ও ঢিবি। পরবর্তীতে মধ্যযুগে সুলতানি ও মুঘল যুগে মুসলিম শাসকদের প্রভাবে ইসলামি স্থাপত্য হিসেবে মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা, জমিদার বাড়ি, প্রাসাদ ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ অঞ্চলে নির্মিত হয় জমিদার বাড়ি, মসজিদ, গির্জা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সকল স্থাপত্যে বাংলার স্থাপত্যশৈলীর সাথে ইউরোপীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটে। কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁও এ নির্মিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটিও ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত একটি স্থাপনা। এ মসজিদটিতে কুমিল্লা অঞ্চলের স্থানীয় উপকরণ ও ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১০ গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি গঠন ও অলংকরণের কারুকার্যের দ্বারা এই অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে স্থান করে নেয়। নবাব ফয়জুন্নেসা কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটির স্থাপত্যে মুঘল রীতি ও ইউরোপীয় রীতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। মসজিদের অলংকরণে পদ্মপাপড়ির মারলন নকশা, আঞ্চলিক ফুল, লতা-পাতা, গাছের মোটিফ, পলেস্তরা প্রলেপিত স্ট্যাকো নকশা, জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার পশ্চিম গাঁয়ে স্থাপিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, অলংকরণ শৈলী ও মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে এর স্বরূপ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে এই প্রবন্ধে।

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষণা পদ্ধতি

"কুমিল্লায় মুসলিম শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন: নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদ" এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তা হলো - মাঠ জরিপ ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি। প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণের জন্য প্রায় সকল উপকরণ মাঠ জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাদির যথাযথ পরিদর্শন, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ গ্রহণ, আলোকচিত্র ধারণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহিত হয়েছে। এসব তথ্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা কর্মের তথ্য–উপাত্তগুলো মাঠ জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যের আলোকে মাঠকর্মের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই পূর্বক যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনাও এ প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। উভয় পদ্ধতিতে আহরিত তথ্যাদির যথার্থ প্রয়োগ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে বর্তমান প্রবন্ধের রচনা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কুমিল্লা জেলার ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে নবাব ফয়জুন্নেসা মসজিদটি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কুমিলা অঞ্চলের ঔপনিবেশিক শাসনামলের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চিত্র তুলে ধরে সেই সময়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করা। সামগ্রিকভাবে এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হলো- প্রত্নস্থলের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানা; প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে প্রত্নস্থল ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর আকার, আকৃতি, সীমারেখা ইত্যাদি নির্ণয় করা; প্রত্নতত্ত্বের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা; প্রত্নস্থলের পরিচিতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা; প্রত্নবস্তুর সময়কাল র্নিণয় করা; প্রত্নস্থানের আশে পাশের প্রকৃতি সম্পর্কে জরিপের মাধ্যমে জানা; ভূ-প্রাকৃতিক ও বর্তমান ইকোলজিক্যাল বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করা; প্রত্নক্ষেত্রের ভূমির বিন্যাস ও ভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা; এবং সর্বোপরি প্রত্নস্থানের সার্বিক তথ্য জানার জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করা ।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে কুমিল্লা জেলায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটি একটি প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে গুরুত্ব পাবে এবং এ স্থাপত্যটিকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস পুনর্গঠন সম্পর্কিত আরও নতুন তথ্য সংযোজিত হবে যার ফলে গবেষক, সাধারণ পাঠক ও সুধীজন কুমিল্লা জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানার ও দেখার সুযোগ পাবে। এছাড়াও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও প্রচারে এ স্থাপত্যটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। যেকোনো জাতির পরিচয় জানতে বিবেকের অনুপ্রেরণা ও আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ইতিহাসের শিকড় অনুসন্ধান করা জরুরি। চলমান সমাজের দর্পণ সংবাদপত্র, ছবি, দলিল ও নথিপত্র ইতিহাসের স্বাক্ষী। কোনো স্থানের শিল্পকর্ম বিষয়ের বিশেষ করে শিল্পকর্মের বিভিন্ন লিখিত, অলিখিত, অঙ্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করে ঐ শিল্পকর্মের সঠিক ইতিহাস জানা যায়।

আমাদের পর্যটন শিল্পের নীতি নির্ধারণেও আলোচনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং প্রবন্ধটির যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

কুমিল্লা জেলা প্রত্নসম্পদ সমৃদ্ধ একটি জেলা। এ জেলায় প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসনকাল পর্যন্ত বহু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সকল প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা নিয়ে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত কিছু গবেষণা গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- আয়শা বেগম কর্তৃক রচিত "প্রত্ননিদর্শন: কুমিল্লা" (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা, ২০১০), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত "বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ" (দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭), আহমেদ হাসান দানি এর প্রকাশিত গ্রন্থ "Muslim Architecture in Bengal" (Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1961) প্রভৃতি। উল্লেখিত গ্রন্থ ও প্রকাশিত গবেষণা পত্রে নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদ সম্পর্কে তেমন কোনো বিশদ আলোচনা হয় নি। বিশেষ করে মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, স্থানীয় উপকরণের প্রভাব, আলঙ্কারিক রীতি এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। এ প্রবন্ধে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, স্থানীয় উপকরণের প্রভাব, আলঙ্কারিক রীতি এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের অবস্থান

কুমিল্লা জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা যার আয়তর ৩০৮৫.১৭ বর্গ কি.মিঃ। এটি গোমতী, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর অববাহিকায় এবং লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।[১] কুমিল্লা জেলা ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমার পূর্ব গোলার্ধের মধ্যখানে অবস্থিত। কুমিল্লা ৯০° ৩১ -৯১°২২ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৩°১৪ - ২৪°১৬ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।[২] সাড়ে ২৩° উত্তর অক্ষাংশ কুমিল্লার উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। এই অক্ষাংশই কর্কটক্রান্তি রেখা।[৩] নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদ কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁও গ্রামের হাসনাবাদ মৌজায় অবস্থিত।[৪] মসজিদটি ডাকাতিয়া নদীর[৫] পশ্চিম-উত্তর এবং জমিদার বাড়ির[৬] পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মসজিদের পশ্চিম ও উত্তর দিকে দুটি বিশাল পুকুর রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি লাকসাম পৌরসভার অন্তর্গত ও বাজারের পাশেই এর অবস্থান। মসজিদটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত স্থাপত্য হিসেবে ঘোষণা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মসজিদ ও জমিদার বাড়ি পরিদর্শনের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে রেল ও সড়ক পথের মাধ্যমে এ স্থানের সাথে যোগযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

মসজিদের নির্মাণ উপকরণ

কুমিল্লা জেলা প্রাচীন বাংলার সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্তিক স্থান। প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলে ঘর বাড়ি নির্মাণে পোড়ামটির ফলক, রোদে শুকানো ইট, কাঠ, চুন, সুরকি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের স্থাপত্যেও এ সকল স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় নির্মিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদ নির্মাণেও এ অঞ্চলের স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

স্থানীয় উপকরণগুলোর মধ্যে আগুনে পোড়ানো ইট, কাঠ, চুন-সুরকি, ধূসর বেলে মাটি প্রভৃতি। এছাড়াও এ মসজিদটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে আমদানি করা লোহা, বিভিন্ন রংয়ের পাথর, সিমেন্টসহ আধুনিক সকল উপকরণ। দেয়ালের পলেস্তরায় ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রং।

মসজিদের নির্মাতা, নির্মাণকাল ও নামকরণ

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের বহির্দেয়ালের পূর্বপাশের প্রাসাদে একটি শিলালিপি[৭] অনুসারে মসজিদটির নির্মাণকাল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ (১৩১০ বঙ্গাব্দ)। এ শিলালিপি থেকে আরও জানা যায় এর নির্মাতা নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী[৮]। লাকসাম নবাববাড়ির পাশেই এর অবস্থান বলে একে 'নবাব বাড়ি মসজিদ' বলে ডাকা হতো। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় নির্মাতার নামানুসারে 'নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদ'।[৯] মসজিদের দক্ষিণ পাশে রয়েছে নবাব ফয়জুন্নেসার কবর।

মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠন

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে সমজিদ এর পূর্ব দিকে একটি প্রবেশ-তোরণ রয়েছে যার আয়তন ২২.৪ ফুটী x ১২.১০ ফুট। প্রবেশ-তোরণ পেরিয়ে ১০ গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের জুল্লাহ (নামাজ ঘর) বহির্ভাগের পরিমাপ ৫৪.২ ফুট x ২৫ ফুট এবং অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ৪৫ ফুট x ১৬ ফুট।

মসজিদের সম্মুখে পূর্ব দিকে অবস্থিত সাহনের বহির্ভাগের পরিমাপ ১১.১০ ফুট x ৫৪.২ ফুট এবং অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ৪৩ ফুট x ৮.৪ ফুট। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মসজিদের আয়তন ৫৪.২ ফুট x ৩৬.১০ ফুট (ভূমি পরিকল্পনা-১)। মসজিদের দেয়াল ৩.৬ ফুট পুরু।

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের জুল্লাহের উপর ৫টি গম্বুজ এবং সাহনের উপর আরও ৫টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদে মোট গম্বুজ ১০টি। জুল্লাহের উপরে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি সবচেয়ে বড় । তার উভয় পাশে আড়াআড়ি খিলানের মাধ্যমে জুল্লাহটিকে বিভক্ত করা হয়েছে। যার ফলে দুটি করে মোট ৪ টি ও কেন্দ্রীয় গম্বুজ দ্বারা ছাদ আচ্ছাদিত করা হয়েছে। সাহনের অংশটি ৫টি খিলানের মাধ্যমে সমান ভাগে ভাগ করে ৫টি ছোট গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজগুলো নির্মাণে পেন্ডেনটিভ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গম্বুজগুলোর শিরোভাগে পদ্মফুল ও কলস সম্বলিত ফিলিয়াল অনেক আকর্ষণীয়। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের কার্নিশে, স্তম্ভগাত্রে এবং মধ্যখানে ফুল-লাতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা রয়েছে।

মসজিদের জুল্লাহতে প্রবেশের জন্য মোট ৫টি প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে খিলান আকৃতির প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথের অভ্যন্তর ভাগের দেয়াল স্ট্যাকো নকশায় অলংকৃত যা মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মসজিদের সাহনে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে ৫টি অর্ধ খিলানের মধ্যে ৫টি উন্মুক্ত প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১ টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ দুটি লোহার জালি নকশা দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে। ৩টি মিহরাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবটির পরিমাপ ২.৩১ মি. x ১মি. এবং দু'পাশের দুটি মিহরাবের পরিমাপ ২.০৬ মি. x ০.৭৯ মি।[১০] মিহরাবগুলো আয়তাকার

ফ্রেমের মধ্যে অর্ধ-গোলায়িত অবতল মিহরাব। মিহরাবের উপরের অংশে স্ট্যাকো নকশায় ফুল-লতা-পাতা প্রভৃতি দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে।

মসজিদের জুল্লাহ (নামাজ ঘর) ১ আইল বিশিষ্ট ৩টি বে (Bay) তে বিভক্ত। মাঝের বে (Bay) টি বড় এবং দুপাশের বে দুটি ছোট। ছোট দুটি বে (Bay) কে আবার একটি খিলান দিয়ে বর্গাকার আকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এই বর্গের উপর একটি ড্রাম স্থাপন করে গম্বুজগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বে (Bay) এর উপর বড় গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে। বে (Bay) গুলো খাজকাটা খিলান দিয়ে তৈরি এবং খিলানগুলোতে বিভিন্ন ফুল-লতা-পাতা প্রভৃতির নকশা আঁকা। মসজিদের সাহন ১ আইল বিশিষ্ট এবং ৫টি বে (Bay) তে বিভক্ত। প্রতিটি বে (Bay) এর উপর ১টি করে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান পাশে তিনস্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বার রয়েছে। যেখান থেকে ইমাম জুমার দিনে খুৎবা পাঠ করেন এবং মুসলিম জাহানের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মসজিদের জুল্লাহের চার কোণে ৪টি এবং সাহনের দু'কোণে ২টি সহ মোট ৬ টি অষ্টভূজাকৃতির পার্শ্ব বুরুজ (মিনার) রয়েছে। এই বুরুজগুলো ছাদের কার্নিশের উপরে উঠে গেছে। বুরুজের শীর্ষে মিষ্টি কুমড়া, পদ্মফুল ও কলস সম্বলিত শীর্ষ দণ্ড রয়েছে। এছাড়াও সমজিদের চার পাশে আরও ৪৪টি ছোট অষ্টভূজাকৃতির বুরুজ রয়েছে।[১১]

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে প্রতি দেয়ালে দুটি করে মোট ৮টি খোপ নকশা রয়েছে। যা মসজিদের আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ (কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামিক গ্রন্থ) রাখা হয়। খোপ নকশাগুলোর উপরে বিভিন্ন ফুল-লতা-পাতার সমন্বয়ে স্ট্যাকো নকশা অলংকৃত হয়েছে ।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের অংশে মিহরাবের উপর ৩টি আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পেছনে আয়তাকার প্যানেলের দুই পাশে ২টি করে ৪টি এবং অন্য দুটি মিহরাবের পেছনে আয়তাকার প্যানেলের দুই পাশে ১টি করে অষ্টভূজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর মাঝে ৫টি করে আয়তাকার প্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনের দেয়াল কিছুটা বাহিরের দিকে প্রক্ষিপ্ত এবং মসজিদের বপ্র (Parapet) এর সমান্তরাল। এছাড়াও মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণের বহির্দেয়ালেও আয়তাকার প্যানেল দ্বারা মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মসজিদের তিন দিকে অর্থাৎ উত্তর -দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রিওয়াক রয়েছে। উত্তর ও দিক্ষণ ৭.৪ ফুট এবং পশ্চিমে ৫.১০ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের পূর্ব প্রান্তে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর রয়েছে যার পূর্ব-পশ্চিমে ৩৪.১০ ফুট এবং উত্তর - দক্ষিণে ৬৩ ফুট। মসজিদটি চার পাশে অনুচ্চ দেয়াল দিয়ে ৩ ফুট উচুঁ একটি ভিত্তির উপর নির্মিত।

মসজিদের অলংকরণ

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটি স্থাপত্যশৈলীতে যেমন চমৎকার তেমনি এর অলংকরণে রয়েছে চিত্তাকর্ষণ। মসজিদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেয়াল স্ট্যাকো নকশায় অলংকৃত। মসজিদের জুল্লাহের চার দেয়ালে ২টি করে মোট ৮টি গভীর খোপ-নকশাগুলো একটি আয়তাকার প্যানালের মধ্যে

একটি খাঁজকাটা খিলানের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। গভীর খোঁপ-নকশার উপরের অংশে আয়তাকার প্যানালের দুই কোণে ফুল-লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা অঙ্কন করা হয়েছে। মাঝে একটি ফুলের টবে একটি ফুলের গাছে ফুটন্ত ফুল এবং চার পাশে গাছের লতা দিয়ে স্ট্যাকো নকশা আঁকা হয়েছে।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব অগভীর অর্ধড্রাম এর সাহায্যে খাঁজকাটা খিলান দিয়ে তৈরি। মিহরাবগুলো তিনস্তর বিশিষ্ট আয়তাকার প্যানেলের মাধ্যমে অলংকৃত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের প্রথম স্তরে প্রকৃতি থেকে আহরিত লতা-গুল্ম-ফুলের নকশার সাথে স্থান করে নিয়েছে জ্যামিতিক নকশাও। দ্বিতীয় স্তরে দুপাশে দুটি ফুলের টবের মধ্যে পদ্ম ফুলের গাছের দুটি শাখা যার মধ্যে রয়েছে পদ্মফুল ও পাঁপড়ি যা দেয়াল থেকে বাহিরের দিকে উৎক্ষিপ্ত। তৃতীয় স্তরের মিহবারে উপরের অংশে খাঁজকাটা খিলান মিহরাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। আয়তাকার প্যানেলের দুই কোণে ফুল, গাছ, লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা এবং মাঝখানে ফুলের টবের মধ্যে গাছ ও ফুটন্ত ফুল। এ টবটি দেয়াল থেকে বাহিরে উৎক্ষিপ্ত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের বাহিরে উপরের অংশে প্রথমে দুপাশে ফুল-লতা-পাতা এবং মাঝখানে জ্যামিতিক নকশা আঁকা রয়েছে। তার উপরে অষ্টভূজাকৃতির ১১টি বুরুজের ন্যায় নকশা। তার পরবর্তী স্তরে ত্রিভূজাকৃতির জালি নকশার একটি সারি দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। এছাড়াও তার উপরে খাঁজকাটা খিলান দিয়ে কেন্দ্রীয় মিহরাবের কাজ শেষ করা হয়েছে। এই নকশা ও ফুল-লতা-পাতার বিভিন্ন ধরনের রংয়ের সমন্বয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুল-লতা-পাতাগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন।

দুপাশের ছোট মিহরাব দুটিও তিন স্তর আয়তাকার প্যানেল এর সাহায্যে অলংকৃত করা হয়েছে। প্রথম স্তরে দুই পাশ দিয়ে দুটি ফুল গাছের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরে মাঝখানের একটি টব থেকে ফুল গাছের দুটি শাখা দুদিকে প্রসারিত হয়ে নিচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তৃতীয় স্তরে খাঁজকাটা খিলানের সমন্বয়ে অগভীর ড্রাম দ্বারা মিহরাবটি তৈরি করা হয়েছে। তার উপরের দুই কোণে লতা-পাতার জ্যামিতিক নকশা এবং মাঝখানে একটি ফুল গাছ থেকে শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি ও ফুটন্ত ফুলের সমাহার। আয়তাকার ফ্রেমের উপরি অংশে কয়েক স্তর দিয়ে সাজানো। নিচে গাছের সারি, তার উপরে লতা-পাতার জ্যামিতিক নকশা এবং উপরে একটি ফুলে গাছের দুটি শাখা প্রসারিত ও ফুটন্ত ফুল। এছাড়াও আয়তাকার ফ্রেমের উপরের অংশে চার কোণাকার বুরুজ এর একটি সারি। তার উপরে লতা-পাতার একটি জ্যামিতিক নকশা দ্বারা ছোট দুটি মিহরাব অলংকৃত হয়েছে। মিহরাবগুলোর অলংকরণ মসজিদের শোভা বর্ধন করে সমজিদের স্থাপত্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

মসজিদের নামাজ ঘরটি (জুল্লাহ) তিনটি বে (Bay) দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে। বে গুলো খাঁজকাটা খিলান এর সমন্বয়ে তৈরি এবং খাঁজকাটার উপরি অংশে ফুল-লতা-পাতার জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকৃত। এ খিলানগুলোও মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটির নিম্নাংশে অষ্টকোণাকার একটি ড্রাম বা পিপার উপরে ১৬টি আয়তাকার ফ্রেম দিয়ে তৈরি। প্রতিটি ফ্রেম পদ্ম-পাতা, ফুল ও গাছের সমন্বয়ে অলংকৃত হয়েছে। এছাড়াও আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে খাঁজকাটা খিলান এর অভ্যন্তরে দুটি আয়তাকার ফ্রেম ও একটি অর্ধচন্দ্র ফ্রেম যার প্রতিটি ফ্রেমে স্বতন্ত্র ফুল-লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা অঙ্কিত হয়েছে। খিলানের উপরে দুই কোণ লতা-পাতার নকশা ও মাঝে ফুল গাছের স্ট্যাকো নকশা দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। আয়তাকার ফ্রেমের বাহিরে উপরে এক সারি স্ট্যাকো নকশা তার উপরে অর্ধ চন্দ্রের অভ্যন্তরে ফুটন্ত

ফুল-লতা-পাতার নকশা অঙ্কিত হয়েছে। গম্বুজের কেন্দ্রে পাঁচ স্তরে ফুল-লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে।

মসজিদের ছোট গম্বুজগুলো বর্গাকার কাঠামোর উপরে ৪টি খাঁজকাটা খিলান ও ৪টি অর্ধ খিলানের কোণগুলো ভরাট করে ড্রামটি স্থাপন করে নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানগুলোর অভ্যন্তর পদ্মপাতা-ফুল এর নকশা দিয়ে পরিপূর্ণ। ড্রামের চার পাশে এক সারি স্ট্যাকো নকশা এবং কেন্দ্রে তিন সারি ফুল-লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা দ্বারা ছোট গুম্বুজগুলো অলংকৃত করা হয়েছে।

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের অভ্যন্তর ভাগ আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে ফুল-লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা এবং জালি নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। এছাড়াও উপরের অংশে জ্যামিতিক নকশা ও গোলায়িত খাঁজকাটা খিলান এর সমন্বয়ে গঠিত প্রবেশপথের অভ্যন্তর ভাগ। অন্য ৪টি প্রবেশপথের অভ্যন্তরেও আয়তাকার ফ্রেমের দুই কোণে ফুল গাছের দৃশ্য ও মাঝে একটি পূর্ণস্ফুটিত ফুল যা দেয়াল থেকে উৎক্ষিপ্ত। আয়তাকার ফ্রেমের উপরে তিনটি স্তর স্ট্যাকো নকশার দ্বারা অলংকৃত হয়েছে।

মসজিদের সাহনের অংশে ৫টি বে (Bay) গোলায়িত খিলানের সমন্বয়ে গঠিত যা মসজিদের শোভা র্বধন করেছে। এছাড়াও এ অংশের ৭টি উন্মুক্ত প্রবেশপথগুলো কৌণিক খিলানের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে যা মসজিদটিকে স্থাপত্যের দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সাহনের অংশে ছোট ৬টি খোপ নকশা এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। মসজিদের বহির্ভাগের দেয়ালে ছোট ও বড় আয়তাকার প্যানেলের মাধ্যমে স্ট্যাকো নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে।

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের অষ্টভূজাকৃতির বুরুজগুলো ছাঁচে ঢালা ব্যান্ড এর সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে ছাদ থেকে উপরে উঠে গেছে। এই বুরুজগুলোর শীর্ষে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন মিষ্টি কুমড়া, কলস, ডালিম এর সমন্বয়ে শীর্ষদণ্ড। এগুলো গ্রাম-বাংলার স্থানীয় উপকরণ।

মসজিদের গম্বুজগুলোর বাহিরের অষ্টকোণাকার অংশে সমান্তরাল বপ্র (Parapet) এবং উপরের অংশে পর্যায়ক্রমে ছত্রী, কলস, পদ্মফুল, পুনরায় কলস, মিষ্টি কুমড়া, ডালিম, কলস এবং ফিনিয়েল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গম্বুজের নিচের অংশে এবং ছাদের কার্নিশে মারলন নকশা মসজিদটিকে অলংকরণের দিক দিয়ে নতুন রূপ দান করেছে। এ সকল অলংকরণের জন্য মসজিদটি মুসলিম নিদর্শনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

মসজিদের সংস্কার

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটি নির্মাণের ৯৩ বছর পর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে জনাব সৈয়দ মোঃ কামরুল হকের তত্ত্বাবধানে প্রথম সংস্কার করা হয়। মসজিদের মুসল্লির জায়গা স্বল্পতার কারণে তিনি মসজিদের পূর্ব পাশে ২৩.৬ ফুট ৪৬.৮ ফুট সম্প্রসারণ করেন (ভূমি নকশা-২)। এছাড়াও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জনাব সৈয়দ মো. মাসুদুল হক এর তত্ত্বাবধানে মসজিদের মেঝেতে টাইলস স্থাপন করেন। জুল্লাহ এর অভ্যন্তরে মেঝে থেকে দেয়ালের নিম্নাংশে ৬ ফুট পর্যন্ত টাইলস সংযোজন করা হয়।

মসজিদের পার্শ্ববর্তী স্থাপনা

নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের পূর্ব দিকে নবাব বাড়ি, বৈঠকখানা ও আনুষাঙ্গিক ভবন অবস্থিত। জমিদার বাড়ীর পশ্চিম ও উত্তরে দুটি বিশাল পুকুর রয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে নবাব ফয়জুন্নেসার সমাধিসহ ১১টি কবর সারিবদ্ধভাবে রয়েছে। তার পাশে নবাব বাড়ি ঈদগাঁহ এবং তার দক্ষিণে নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি কলেজ অবস্থিত। নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ডাকাতিয়া নদী প্রবহমান।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটি কুমিল্লা জেলার ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত স্থাপত্য ও অলংকরণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং কিভাবে এটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সম্প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে শুধুমাত্র সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। অন্যথায় এর কলেবর অনেক বেড়ে যেত। এই মসজিদের চার পার্শ্বে বয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যেমন-জমিদার বাড়ি, পাঁচ গম্বুজ মসজিদ (১৮৬৯ খ্রি.), কাজীর মসজিদ (১৬৫৯ খ্রি.)। এছাড়াও পশ্চিম গাঁও এর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ, দিঘি, মৃৎপাত্র ও অন্যান্য প্রত্নসম্পদ। এ পত্নস্থলগুলো নিয়ে পর্যটক, পাঠক ও গবেষকদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এ সকল প্রত্নস্থল অধিকতর নিবিড় মাঠ-জরিপ, পর্যবেক্ষণ ও পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তথ্য আহরণ করতে পারলে সেই আঙ্গিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

মন্তব্য

ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত দশ গম্বুজ বিশিষ্ট নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের এক অনন্য সুন্দর স্থাপনা ও নিদর্শন। যা এ অঞ্চলের ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মসজিদটি একটি বড় গম্বুজ ও তার দুই পাশে মোট ৪টি গুম্বুজসহ পেছনে আরও ৫টি ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার পরিকল্পনা; মসজিদের মিনার বা বুরুজগুলো অষ্টকোণাকার যা মসজিদের ছাদের কার্নিশ থেকে অনেক উঁচুতে এবং শীর্ষে মিষ্টি কুমড়া, কলস ও ডালিমের সমন্বয়ে শীর্ষদণ্ড; কার্নিশ ও বুরুজে বন্ধনীর ব্যবহার; মসজিদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে দেয়ালের গায়ে স্ট্যাকো নকশায় পরিপূর্ণ, যা সচরাচর তৎকালীন সময়ে বাংলার স্থাপত্যে বিরল। এই ধরনের স্ট্যাকো নকশা বাংলার ইতিহাসে সুলতানি যুগে নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, কুসুম্বা মসজিদ, দারাস বাড়ি মসজিদ, বাঘা মসজিদ ইত্যাদি মসজিদে পাথর ও ইটের শৈল্পিক নকশা দেখতে পাই। কিন্তু তার মাঝে ৩০০ বছরে আর এমন উন্নত কাজ দেখা যায়নি। তবে ২০ শতকের শুরুতে ১৯০৩ সালে ইট পাথরের না হলেও চুন-শুরকি-বালি এর মাধ্যমে এত সুন্দর স্ট্যাকো নকশা মুসলিম শিল্পকলার অতীতের গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেদিক থেকে এই স্থাপত্যটি আধুনিক বিশ্বের Outstanding Universal Value অর্জন করছে বলে আমার বিশ্বাস।

অলংকরণ হিসেবে মসজিদের গাত্রে ব্যবহৃত ফুল-লতা-পাতার স্ট্যাকো নকশা ও জ্যামিতিক নকশা এবং গম্বুজ ও বুরুজের শীর্ষে ব্যবহৃত ছত্রী, পদ্মফুল-কলস সম্বলিত ফিনিয়েল এবং মুসলিম শিল্পকলার উন্নত শৈল্পিক নকশাগুলো মুসলমানদের গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ মসজিদ নির্মাণে মুঘল ও ইউরোপীয় রীতির সংমিশ্রণে এক নবরূপ পরিগ্রহ করে। মসজিদে ব্যবহৃত বুরুজ ও গম্বুজের শীর্ষে ছত্রী, অলংকরণে পদ্মপাঁপড়ির মারলন নকশা এবং আঞ্চলিক ফুল-কলি, লতা-পাতা, গাছ, কলস, মিষ্টি কুমড়া, ডালিম ইত্যাদি মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে। দেয়ালে টেরাকোটা নকশার পরিবর্তে গাত্র অলংকরণে পলেস্তরা প্রলেপিক স্ট্যাকো নকশা স্থান নেয়। স্ট্যাকো অলংকরণে বালি, সিমেন্ট, পাথর ও শুরকি দেশীয় খোদাই নকশার প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

মসজিদে ব্যবহৃত দেশজ উপকরণ হিসেবে গম্বুজ ও বুরুজে ব্যবহৃত হয়েছে কলস, মিষ্টি কুমড়া, ডালিম, পদ্ম পাঁপড়ি, ছত্রী প্রভৃতি। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে ব্যবহৃত গাত্র অলংকরণে পদ্ম ফুল, লতা-পাতা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। এসকল উপকরণ এ অঞ্চলে অনেক বেশি উৎপাদিত হতো এবং উদ্ভিদ জন্মানোর কারণে এর প্রভাব এ স্থাপত্যে পড়ে। এই উপাদানগুলোর ব্যবহার যেমন এই অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয় তেমনি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি। এর মাধ্যমে জানতে পারি প্রান্তিক অঞ্চলের সাথে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। মসজিদটি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি মুসলিম শিল্পকলার গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদে গ্রাম-বাংলার উপাদানের ব্যবহার, স্থানীয় প্রভাব, নির্মাণ পদ্ধতি, গঠন, অলংকরণ প্রভৃতি মুঘল ও ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির সমন্বয়ে নির্মিত হয়। অলংকরণে মসজিদের দেয়ালে ফুল-লতা-পাতার জ্যামিতিক নকশা এবং স্ট্যাকো নকশায় পরিপূর্ণ মসজিদটি মুসলিম শিল্পকলার এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আধুনিক মুসলিম বিশ্বের কাছে এটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং এ মসজিদ কমপ্লেক্সটি বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) এর তালিকায় স্থান পাওয়ার দাবি রাখে। এ মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুমিল্লা জেলার এ স্থাপত্যটি ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য, পঠন-পাঠনের জন্য এবং পর্যটকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে লাকসাম জমিদার বাড়ি ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য প্রত্নস্থলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ডাকাতিয়া নদী, রেলওয়ে জংশন ইত্যাদিকে ঘিরে পর্যটন অঞ্চলের ঘোষণার মহাপরিকল্পানাও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যৌথ পর্যালোচনায় এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটবে। নবাব ফয়জুন্নেসা জামে মসজিদটি বিশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কুমিল্লার মুসলিম শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে বলে আশা করা যায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আবুল কাসেম, *কুমিল্লার ইতিহাস - আদি পর্ব* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনি, ২০০৮), পৃ. ২৯

২. শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা - কুমিল্লা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ২৫

৩. আবুল কাসেম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

4. Shahanara Husain, *'Nawab Faizunnesa Chaudhurani: An outstanding Bengali Muslim Lady of the 19th Century'*, Paper presented at 1st SAARK History Conference, April 1988, pp. 5-7

৫. ডাকাতিয়া নদী ভারতের রঘুনন্দন পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়ে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মিয়া বাজার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর এটি সোনাইছড়ি দিয়ে লাকসামে প্রবেশ করেছে। লাকসাম হয়ে মনোহরগঞ্জ-শাহরাস্তি-হাজীগঞ্জ পার হয়ে এই নদীটি চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে মিশেছে। ডাকাতিয়াকে বলা হতো 'লাকসামের দুঃখ'। লাকসাম ভাগ হয়ে মনোহরগঞ্জ উপজেলা হওয়াতে এখন তা এই উপজেলার মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। এককালের ভরা যৌবনা ডাকাতিয়ার উপচে পড়া স্রোতে দু'তীরে গড়ে উঠেছে ব্যবসা কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনবসতি। কিন্তু দিন দিন পলি মাটিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে ডাকাতিয়া নদী। তাই ডাকাতিয়া নদী ও এর সংযোগ খালগুলো সরকারি ভাবে খনন করা জরুরী। তাহলে তার হারানো যৌবন পুনরায় ফিরে পাবে।

৬. লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁয়ে 'নবাব ফয়জুন্নেছা হাউজ' অবস্থিত যা সর্বসাধারণের কাছে 'নবাব বাড়ি' হিসেবে পরিচিত। ১৮৬০-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ বাড়ি নির্মাণ করেন নবাব ফয়জুন্নেছা। এই রাজকীয় স্থাপত্যশৈলীর একটি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ি। বাড়ির সামনে সীমানা প্রাচীরসহ রাজকীয় তোরণ রয়েছে। বাড়ির আঙিনার পশ্চিম পার্শ্বে একটি বড় ভবন বর্তমানে পরিত্যক্ত ও জীর্ণ দশায় রয়েছে যা তখনকার 'অতিথিশালা' ছিল। এর পেছনের আঙিনায়ও একটি ভবন রয়েছে। তবে 'নবাব ফয়জুন্নেছা হাউজ' এখানকার প্রধান বাড়ি। বাড়িটি বর্তমানে পর্যটক ও গবেষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাড়িটিতে বর্তমানে নবাব ফয়জুন্নেছার পঞ্চম প্রজন্ম সৈয়দ কামরুল হক সপরিবারে বসবাস করছেন।

৭. শিলালিপির ফারসি রূপ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لا اله الا الله محمد رسول الله

هتبن نوّابہ مرحومي فيض النساء : جهانين وہ يكتاور وشنضمير منبائيں يہ مسجد
كواس شان سے كہ تعمير جسكى ہولى بے نظير نصيب كو ہوا من صلاين جنان :
رہے انسے راضى وہ رب قدير زيرنگرنى جناب ناب مسير شاہ انير الحق صاحب
دنيک نہا زنوابہ (حجرى تكمہ) مرحومہ ورنمير و ل لى س:

পাঠ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

বিরাজিছে ছাওয়াতে হারহুমে ফায়জুন্নেছা: জাহানে ওয়া বাকতাওরদ সাতফির বানায়ি মাজদুলুস শানি, লাহু তাহমিরি জাগি পুলে ওয়া নাজির নাদির শাকওয়াহা আয় ছালাহি হানান। আমে আনি রাজি ওয়া রাব কাদিম যিদেনগারনি জিনদি সায়িদ শাহ আজিজুল হক দাউসনেক।

বাংলা:

"বিরাজিছে স্বর্গধামে এ মসজিদ নির্মাণকারিণী;

অদ্বিতীয়া দানশীলা নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী"।

নির্মাণ কাল বাংলা সন ১৩১০ অনুসারে ইংরেজি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। (সূত্র: শিলালিপি)

৮. কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁও গ্রামে এক জমিদার বংশে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আহমদ আলী চৌধুরী ও মাতা আরফান্নেছা চৌধুরানী। তাঁর পিতা ছিলেন হাসনাবাদ-পশ্চিমগাঁও এর জমিদার। পারিবারিক পরিবেশে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজ বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি একাধারে আরবি, ফারসি, উর্দু এর পাশাপাশি বাংলা ও সংস্কৃতি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন জমিদার, নারীশিক্ষার প্রবর্তক, সমাজসেবক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে জমিদার মুহম্মদ গাজীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং এক সময় তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি জমিদারি লাভ করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নবাব' উপাধি লাভের মাধ্যমে উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাবে পরিণত হন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'রূপজালাল'। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে নারী শিক্ষা বিকাশের জন্য কুমিল্লা শহরের বাদুরতলায় স্থাপন করেন বালিকা বিদ্যালয় যা বর্তমানে 'নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন ১০০০০ টাকা দান করেন, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ্ব পালন করতে গিয়ে মক্কায় একটি মাদ্রাসা ও একটি মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও নবাব বাড়ির সামনে দশগম্বুজ মসজিদ, শৈলরানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ, পুকুর-দিঘি খনন এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করে এ মহীয়সী নারী অমর হয়ে আছেন। তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে কবর দেওয়া হয় নবাব ফয়জুন্নেছা জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে।

৯. শামসুজ্জামান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

১০. আয়শা বেগম, *প্রত্ননিদর্শন: কুমিল্লা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০১০), পৃ. ১৩০

১১. শামসুজ্জামান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯

আলোকচিত্র

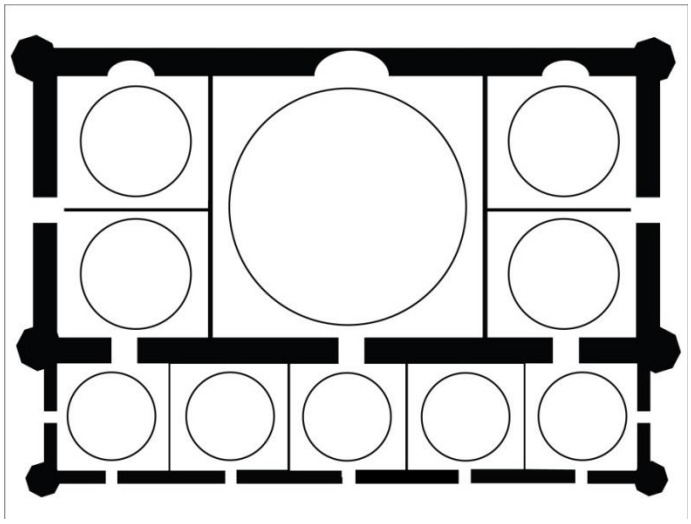

চিত্র ১: ভূমি নকশা-১

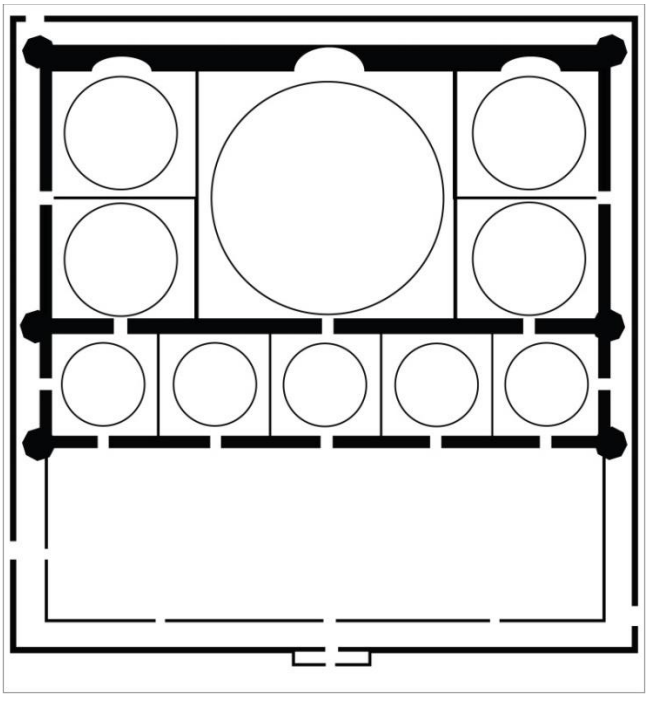

চিত্র ২: ভূমি নকশা-২

চিত্র ৩: সম্পূর্ণ মসজিদ

চিত্র ৪: প্রবেশ তোরণ

চিত্র ৫: কেন্দ্রীয় মিহরাব

চিত্র ৬: নামাজঘর

চিত্র ৭: মসজিদের পেছনের দৃশ্য

চিত্র ৮: উন্মুক্ত প্রবেশ পথ

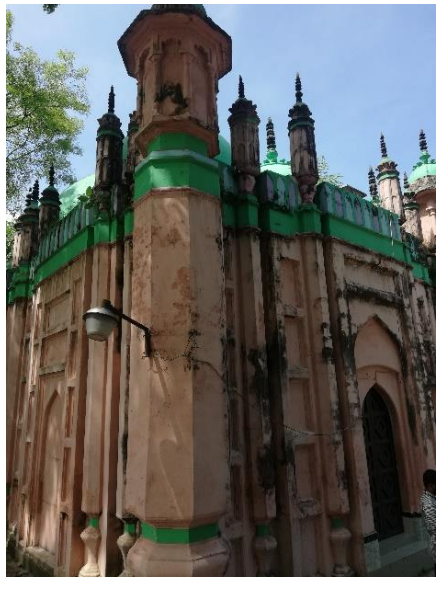

চিত্র ৯: অষ্টাভূজাকৃতির বুরুজ

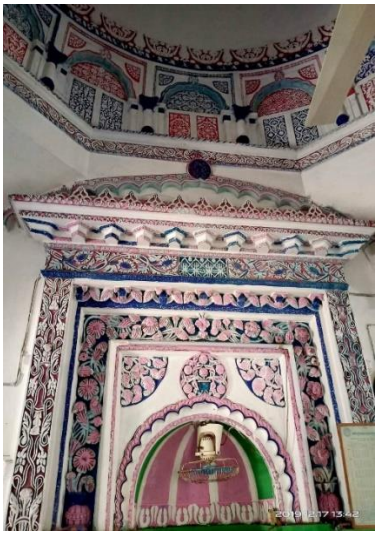

চিত্র ১০: কেন্দ্রীয় মিহরাব অলংকরণ

চিত্র ১১: ছোট মিহরাব অলংকরণ

চিত্র ১২: প্রধান প্রবেশ পথের অভ্যন্তরীণ অংশের অলংকরণ

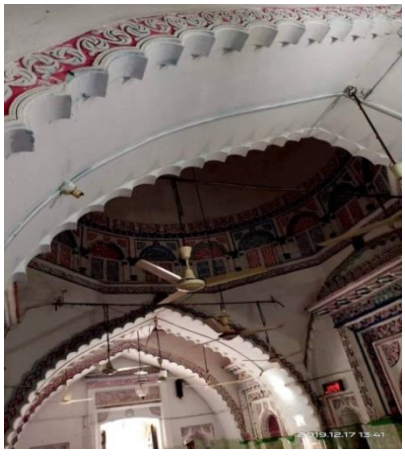

চিত্র ১৩: খাজকাটা খিলান

চিত্র ১৪: কেন্দ্রীয় গম্বুজের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

চিত্র ১৫: ছোট গম্বুজের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

চিত্র ১৬: মসজিদের ছাদ ও গম্বুজ

চিত্র ১৭: গম্বুজ ও ফিনিয়াল

চিত্র ১৮: সম্পূর্ণ ছাদ

চিত্র ১৯: ছাদ ও গম্বুজের কার্নিশে মারলন নকশা

চিত্র ২০: স্ট্যাকো অলংকরণ

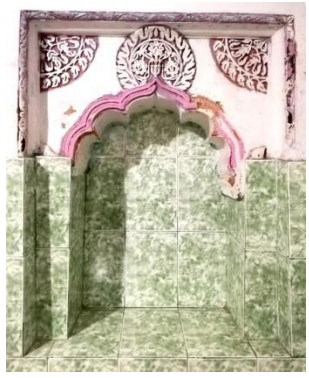

চিত্র ২১: খোঁপ নকশা

চিত্র ২২: খোঁপ নকশার উপরের ফুল গাছের স্ট্যাকো নকশা নকশা

চিত্র ২৩: ছোট মিহরাবের উপরের ফুল গাছের স্ট্যাকো

চিত্র ২৪: প্রবেশ পথের উপরে বিশেষ নকশা

চিত্র ২৫: নবাব ফয়জুন্নেছার কবর

চিত্র ২৬: নবাব ফয়জুন্নেছা জমিদার বাড়ি

চিত্র ২৭: নবাব বাড়ির অতিথি ভবন